ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের বৈশিষ্ট্য: বাস্তবমুখিতা

সাইয়্যেদ কুতুব

[????????????? ***(worldview) :*** *মূল আরবিতে সাইয়্যিদ কুতুব তাসাওউর (?????????????? ???????????????????) বযবহার করেছেন। সাধারণত তাসাওউর শবেদর র্অথ করা হয় ‘concept’/‘conception’ বা ধারণ হিসেবে। তবে লেখক এ শবদটিকে আরও বযাপক র্অথে বযবহার করেছেন।*

তিনি ইসলামি তাসাওউর বলতে বুঝিয়েছেন কুরআন ও সুন্নাহ থেকে পাওয়া অস্তিত্বের সামগ্রিক বযাখযাকে। যে বযাখযার মধেয স্রষ্টা, সৃষ্টিজগৎ, মানুষের উৎস ও ভূমিকা, জীবনের উদ্দেশ্য, নৈতিকতা, সমাজ, শাসন—সবই অর্ন্তভুকত।

লেখক যে র্অথে তাসাওউর শবদটি বযবহার করেছেন র্অথের দিক থেকে ‘ধারণা’, ‘দৃষ্টিভঙ্গি’ ইৎযাদি শবেদর তুলনায় ইংরেজি ওর্য়াল্ডভিউ (worldview) শবদটি তার সাথে অধিক সামঞ্জস্যর্পূণ। দুঃখজনকভাবে ওর্য়াল্ডভিউ শবেদর যেসব বাংলা করা হয়েছে, সেগুলো হয় অৎযন্ত অপ্রচলিত হবার কারণে অচেনা প্রায়, অথবা মূলভাব প্রকাশে বর্যথ কিংবা দুটোই। তাই অনুবাদে ‘ওর্য়াল্ডভিউ’ শবদটিই বযবহার করা হয়েছে।

সংকেষপে ওর্য়াল্ডভিউ হলো :

স্রষ্টা, মহাবিশ্ব, মানুষ, ইতিহাস, জীবনমৃৎযু, জ্ঞানসহ নানা বিষয়ে মৌলিক বিশ্বাসের সমষ্টি। এটি চিন্তার ওই কাঠামো, যার সাপেকেষ, যার মাধযমে এবং যার ভেতরে মানুষ বাস্তবতাকে বোঝার ও বযাখযা করার চেষ্টা করে। ওর্য়াল্ডভিউ হলো ওই লেন্স, ওই চশমা, যার ভেতর দিয়ে আমরা পৃথিবীকে দেখি। প্রৎযেকের যেমন নিজস্ব ভাষা থাকে, তেমনিভাবে প্রৎযেকের একটা ওর্য়াল্ডভিউ থাকে। হয়তো তারা সেটাকে ‘ওর্য়াল্ডভিউ’-এর মতো গালভরা কোনো শবদ হিসেবে চেনে না, কিন্তু শবেদর পেছনের জিনিসটা কমবেশি সবার মধেযই থাকে।]

বলুন, ‘পবিত্র মহান আমার রব! আমি তো একজন মানব-রাসূল ছাড়া কিছু নই?’ (সূরা ইসরা, ১৭ : ৯৩)

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য—বাস্তবমুখিতা। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ সত্য এবং বাস্তবতা নিয়ে কথা বলে। কাজের কথা, গঠনের কথা বলে। বলে স্রষ্টার কথা এবং মানবজীবনের বাস্তবতার কথাও। বাস্তব জীবনে সক্রিয় নয়, এমন বিমূর্ত ধ্যানধারণা কিংবা অসম্ভব আদর্শ নিয়ে ইসলাম মাথা ঘামায় না। মানবজাতির জন্য ইসলাম যে জীবনব্যবস্থা তুলে ধরে, সেটিও অত্যন্ত বাস্তবসম্মত। ইসলাম মানুষকে উন্নতি ও বিকাশের সর্বোচ্চ অবস্থানের দিকে চালিত করে, যা পার্থিব জীবনে অর্জন করা সম্ভব। আমরা এখন ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের বাস্তবমুখিতার বৈশিষ্ট্যের এ দুটি দিক ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ আমাদের আল্লাহর কথা বলে—ওই একক সত্তা, যিনি সমস্ত ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ইসলাম কোনো বিমূর্ত সত্তার কথা বলে না, যার অস্তিত্ব চিন্তার জগতে সীমাবদ্ধ। ইসলাম এমন স্রষ্টার কথা বলে, যিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। সৃষ্টির মাধ্যমে যার অস্তিত্বের এবং মহত্ত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই স্রষ্টা যা ইচ্ছা, তা-ই করেন। মহাবিশ্বের পরিবর্তন এবং গতির মাধ্যমে তিনি তাঁর ইচ্ছা ও শক্তি প্রকাশ করেন। মহান আল্লাহ্ আমাদের চারপাশের বাস্তবতাকে প্রভাবিত করেন, টিকিয়ে রাখেন। আর মানুষ জীবনে মহান আল্লাহর প্রভাব উপলব্ধি করতে পারে।

> অতএব তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো, যখন তোমরা উপনীত হও সন্ধ্যায় আর সকালে, আর অপরাহ্নে ও যোহরের সময়ে; আসমান ও জমিনে সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন এবং জীবিত থেকে বের করেন মৃতকে। আর তিনি জমিনকে জীবিত করেন তার মৃত্যুর পর। আর এভাবেই তোমরাও উত্থিত হবে।
>
> আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমরা মানুষ, এখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছো। আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই সৃষ্টি করেছেন স্ত্রীদের, যাতে তোমরা তাদের কাছে পাও প্রশান্তি। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। এর মাঝে অবশ্যই বহু নিদর্শন আছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।
>
> আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে, আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও তোমাদের বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য। আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে, রাতে ও দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং তোমাদের অন্বেষণ তাঁর অনুগ্রহ হতে। নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্য, যারা শোনে। তাঁর নিদর্শনের মধ্যে হলো এই যে, তিনি তোমাদেরকে দেখান বিদ্যুৎ, ভীতি ও ভরসা সঞ্চারীরূপে, আর তিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন, যা দিয়ে জমিনকে তার মৃত্যুর পর আবার জীবিত করেন, নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য, যারা অনুধাবন করে।
>
> আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে, আসমান ও জমিন স্থিতিশীল থাকে তাঁরই নির্দেশে। তারপর তিনি যখন তোমাদেরকে জমিন থেকে বের হয়ে আসার জন্য একবার আহ্বান করবেন, তখনই তোমরা বের হয়ে আসবে।
>
> আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে, সব তাঁরই। সবকিছুই তাঁর অনুগত। তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন, অতঃপর তার পুনরাবৃত্তি করবেন, আর তাঁর জন্য তা খুবই সহজ। আসমানসমূহ ও জমিনে সর্বোচ্চ গুণাবলি তাঁরই, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা রূম, ৩০ : ১৭-২৭)
>
> আল্লাহই শস্যদানা ও বীজ বিদীর্ণকারী, তিনি মৃত থেকে জীবন্তকে বের করেন এবং জীবন্ত থেকে মৃতকে। তিনিই আল্লাহ। সুতরাং (সৎপথ থেকে) কোথায় তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে?
>
> তিনি প্রভাত উদ্ভাসক। তিনি রাতকে প্রশান্তি এবং সূর্য ও চাঁদকে সময় নিরূপক করেছেন; এটা পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী আল্লাহর নির্ধারণ। আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য তারকারাজি, যাতে তোমরা এ দ্বারা পথপ্রাপ্ত হও স্থল ও

সমুদ্রের অন্ধকারে। আমি আমার নিদর্শনগুলোকে জ্ঞানীদের জন্য বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি।

আর তিনিই তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর রয়েছে দীর্ঘ ও স্বল্পকালীন বাসস্থান। অবশ্যই আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করেছি এমন কওমের জন্য, যারা ভালোভাবে অনুধাবন করে। তিনিই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। অতঃপর তা দ্বারা আমি সকল প্রকার উদ্ভিদ উদ্‌গত করি, অতঃপর তা থেকে সবুজ পাতা উদ্‌গত করি, অতঃপর তা থেকে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপন্ন করি, খেজুর গাছের মোচা থেকে ঝুলন্ত কাঁদি নির্গত করি, আঙুরের বাগান সৃষ্টি করি, আর সৃষ্টি করি যাইতুন ও ডালিম, সেগুলো একই রকম এবং বিভিন্ন রকমও। লক্ষ করো তার ফলের প্রতি, যখন গাছে ফল আসে আর ফল পাকে। নিশ্চয় মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য এগুলোর মধ্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে।

আর তারা জিনকে আলাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করে, অথচ তিনিই এদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর তারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহর প্রতি পুত্র-কন্যা আরোপ করে; তিনি পবিত্র-মহিমান্বিত! এবং তারা যা বলে, তিনি তার ঊর্ধ্বে। তিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা, তাঁর সন্তান হবে কীভাবে? তাঁর তো কোনো সঙ্গিনী নেই। আর তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ অবগত। তিনিই তো আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই, তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা; কাজেই তোমরা তাঁরই ইবাদাত করো, তিনি সমস্ত বিষয়ের কর্মবিধায়ক। দৃষ্টিসমূহ তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না, অথচ তিনি সকল দৃষ্টিকে আয়ত্তে রাখেন এবং তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত। (সূরা আনআম, ৬ : ৯৫-১০৩)

বলুন, ‘সকল প্রশংসা আল্লাহরই এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রতি!’ শ্রেষ্ঠ কি আল্লাহ, নাকি তারা যাদেরকে শরীক করে, তারা?

বরং (শ্রেষ্ঠ) তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমানসমূহ ও জমিন এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি, তারপর আমরা তা দ্বারা মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি, যার বৃক্ষাদি উৎপন্ন করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহর সাথে কি অন্য কোনো ইলাহ আছে? বরং তারা এমন এক সম্প্রদায়, যারা (আল্লাহর) সমকক্ষ নির্ধারণ করে।

বরং (শ্রেষ্ঠ) তিনি, যিনি জমিনকে করেছেন বসবাসের উপযোগী এবং তার মাঝে মাঝে প্রবাহিত করেছেন নদীনালা এবং তাতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বত ও দুই সাগরের মাঝে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায়; আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ আছে কি? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।

বরং (শ্রেষ্ঠ) তিনি, যিনি নিরুপায়ের আহ্বানে সাড়া দেন এবং বিপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে জমিনের প্রতিনিধি বানান। আল্লাহর সাথে কি অন্য কোনো ইলাহ আছে? তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো।

বরং (শ্রেষ্ঠ) তিনি, যিনি জল-স্থলের গভীর অন্ধকারে পথ দেখান এবং যিনি তাঁর (বৃষ্টিরূপী) অনুগ্রহের পূর্বক্ষণে শুভবার্তাবাহী বাতাস প্রেরণ করেন? আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহ আছে কি? তারা যাকে (আল্লাহর সাথে) শরীক করে, আল্লাহ তা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে।

> বরং (শ্রেষ্ঠ) তিনি, যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন, অতঃপর তার পুনরাবৃত্তি করেন এবং যিনি তোমাদেরকে আসমান ও জমিন থেকে রিয্ক দান করেন। বলুন, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ করো।' (সূরা নাম্‌ল, ২৭ : ৫৯-৬৪)

> তিনি আসমানসমূহ ও জমিনের স্রষ্টা। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে যুগল সৃষ্টি করেছেন, চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যেও সৃষ্টি করেছেন জোড়া, এভাবেই তিনি তোমাদের বংশধারা বিস্তৃত করেন, কোনোকিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরা শূরা, ৪২ : ১১-১২)

> নিশ্চয় আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিনকে ধারণ করেন, যাতে তারা স্থানচ্যুত না হয়। আর যদি তারা স্থানচ্যুত হয়, তাহলে তিনি ছাড়া আর কে আছে, যে এগুলোকে ধরে রাখবে? নিশ্চয় তিনি পরম সহনশীল, অসীম ক্ষমাপরায়ণ। (সূরা ফাতির, ৩৫ : ৪১)

প্লেটো, অ্যারিস্টোটল ও প্লটিনসের মতো দার্শনিকদের ঈশ্বরের ধারণার সাথে বিস্তর ফারাক আছে ইসলামের শিক্ষার। গ্রীক দার্শনিকরা এক বিমূর্ত ঈশ্বরের কথা বলে। এই 'ঈশ্বর' আসলে তাদের বুদ্ধিমত্তা আর যুক্তির ফসল। তাদের কল্পিত ঈশ্বর নিষ্ক্রিয়, তার কোনো ক্ষমতা নেই, সে এক বিমূর্ত ধারণা কেবল।

এই দার্শনিকরা 'শুদ্ধতা' আর 'পরিপূর্ণতা'র এমন এক ধারণা আবিষ্কার করেছে, যা তাদের ঈশ্বরকে কোনো ক্ষমতার অধিকারী হতে দেয় না, কোনো কাজও করতে দেয় না। বাধ্য হয়ে তারা এই 'ঈশ্বর' বা 'পরম সত্তা'র নিচে মধ্যবর্তী কিছু দেবতা বা সত্তার ধারণা তৈরি করে। তাদের এসব মধ্যবর্তী সত্তা বা ছোট দেবতাদের সাথে গ্রীক পুরাণের দেবদেবীদের মিল সহজেই চোখে পড়ে। এ ব্যাপারে প্রফেসর আল-আক্কাদ[1] বলেন,

> প্লেটোর দর্শনে অস্তিত্বের দুটি পর্যায় আছে : পরম বুদ্ধিমত্তার পর্যায় এবং আদি বস্তুর পর্যায়। সব ক্ষমতা আসে পরম বুদ্ধিমত্তার পর্যায় থেকে। আদি বস্তুর পর্যায় থেকে আসে সব ব্যর্থতা আর ত্রুটি। আর এ দুই পর্যায়ের মাঝে থাকে বিভিন্ন ধরনের মধ্যবর্তী সত্তা। পরম বুদ্ধিমত্তা থেকে যা কিছু তারা গ্রহণ করে, তার ভিত্তিতে তাদের উত্থান হয়। আদি বস্তু থেকে গ্রহণ করার ভিত্তিতে অবনতি হয় তাদের।

> এই মধ্যবর্তী সত্তাদের মধ্যে অনেকে দেবতা বা উপদেবতা, আর অন্যগুলো হলো মানুষের আত্মা। পৃথিবীতে দুঃখ, কষ্ট আর মন্দের উপস্থিতিকে প্লেটো ব্যাখ্যা করেছিলেন এই সত্তাদের অস্তিত্বের মাধ্যমে। অন্যদিকে পরম সত্তা স্থান ও কাল থেকে মুক্ত। তার থেকে কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই প্রবাহিত হয় না। পরম সত্তা আর আদি বস্তুর মাঝে অবস্থান করা মধ্যবর্তী সত্তারাই মূলত মহাবিশ্বের স্রষ্টা। সৃষ্টির মাঝে থাকা দুঃখ, দুর্দশা আর মন্দের জন্য দায়ী তারাই।

> বস্তুজগতের সব ঘটনা অর্থহীন মায়া কেবল। সেগুলো পরিবর্তিত হয়, রূপান্তরিত হয়, গ্রহণ করে বিভিন্ন আকার ও কাঠামো। তাদের কোনো স্থায়িত্ব নেই। স্থায়িত্ব এবং নিত্যতা কেবল পরম বুদ্ধিমত্তার জন্য নির্দিষ্ট। আর পরম বুদ্ধিমত্তার মাঝে বাস করে প্রকৃত রূপ (forms) বা ধারণা। পরম বুদ্ধিমত্তার মতো পরম ধারণাগুলোও চিরন্তন, অপরিবর্তনীয়।

বস্তুজগতে থাকা সবকিছুর আদিরূপ হলো পরম বুদ্ধিমত্তার মাঝে থাকা এই রূপ (forms) বা ধারণাগুলো। বস্তুজগতের প্রতিটি গাছ কোনো না কোনোভাবে ত্রুটিপূর্ণ। পরম, নিখুঁত গাছের অস্তিত্ব পরম বুদ্ধিমত্তার জগতে। সেখানেই এর চিরস্থায়ী অবস্থান। আমাদের সামনে থাকা সব গাছ এই পরম গাছের ত্রুটিপূর্ণ অনুকরণ কেবল।[2]

প্রত্যেক গতির পেছনে কোনো না কোনো চালিকাশক্তি বা চালক থাকতে হয়। আবার সেই চালকের গতির পেছনে থাকতে হয় অন্য কোনো চালক। এভাবে ধাপে ধাপে পেছনে গেলে শেকলের শেষ প্রান্তে অবশ্যই এমন কোনো চালককে থাকতে হবে, যে নড়ায়; কিন্তু নিজে নড়ে না। যে চালনা করে; কিন্তু চালিত হয় না নিজে। তা না হলে এই প্রক্রিয়া অতীতের দিকে অসীম ধারার মতো চলতেই থাকবে। তাই অ্যারিস্টোটলের মতে ঈশ্বর হলো প্রথম কারণ অথবা প্রথম চালক যে নড়ায়; কিন্তু নিজে নড়ে না।

এই ঈশ্বরকে অবশ্যই চিরন্তন হতে হবে, যার কোনো শুরু বা শেষ নেই। তাকে হতে হবে নিখুঁত, তার মধ্যে কোনো বিকাশ, পরিবর্তন হতে পারবে না, থাকতে পারবে না কোনো গতি। তাকে একক হতে হবে, সে একাধিক হতে পারবে না। তার অস্তিত্ব হবে স্বাধীন, অন্য কোনো অস্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল হবে না। সে স্থির ও স্থায়ী।

প্রত্যেক ঘটনার পেছনে একটি কারণ থাকে, প্রত্যেক গতির পেছনে থাকে একজন চালক। ঈশ্বর হলেন প্রথম কারণ, প্রথম চালক। ঈশ্বর মহাবিশ্বের স্রষ্টা নন, তবে তিনি মহাবিশ্বের চালিকা শক্তি। অ্যারিস্টটলের এই ঈশ্বর হলো পরম চিন্তা। এমন এক সত্তা, যে চিরন্তনভাবে কেবল নিজেকে নিয়ে ধ্যানমগ্ন।

মহাবিশ্বের চিরন্তন হবার মতের প্রতি অ্যারিস্টটলের ঝোঁক দেখা যায়। তার বই ডায়ালেকটিক-এ তিনি বলেছেন, যুক্তি বলে মহাবিশ্ব চিরন্তন, এর শুরু বা শেষ নেই। এ ব্যাপারে তার‌ আলোচনার সারমর্ম নিম্নরূপ :

ধরা যাক, ঈশ্বর মহাবিশ্বের উৎপত্তি করেছেন। এক্ষেত্রে তিনটি সম্ভাবনা থাকে—

১. পৃথিবীর উৎপত্তি ঘটানোর পর তিনি আগের মতোই আছেন।

২. পৃথিবীর উৎপত্তি ঘটানোর পর তার অবস্থার অবনতি হয়েছে।

৩. পৃথিবীর উৎপত্তি ঘটানোর পর তার অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

অ্যারিস্টটলের মতে, ওপরের প্রতিটি সম্ভাবনাই ঈশ্বরের ক্ষেত্রে অসম্ভব। যদি বলা হয়— মহাবিশ্বের উৎপত্তি ঘটানোর পর ঈশ্বর আগের মতোই আছেন, তাহলে মহাবিশ্বের উৎপত্তি ছিল একটি অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন কাজ। আর ঈশ্বর তো অর্থহীন কিংবা উদ্দেশ্যহীন কাজ করতে পারেন না।

যদি বলা হয়, মহাবিশ্বের উৎপত্তি ঘটনার পর ঈশ্বরের মধ্যে বিকাশ বা উন্নতি হয়েছে, তাহলে বলতে হবে মহাবিশ্বের উৎপত্তি ঘটানোর আগে ঈশ্বর নিখুঁত ছিলেন না। এটাও ঈশ্বরের ক্ষেত্রে বলা অসম্ভব। একইভাবে এ-ও বলা সম্ভব নয় যে,

মহাবিশ্বের উৎপত্তি ঘটানোর পর ঈশ্বরের অবনতি হয়েছে।

ঈশ্বরের ইচ্ছা যদি চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় হয়, তাহলে মহাবিশ্বকেও চিরন্তন হতে হবে। কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছাই মহাবিশ্বের অস্তিত্বের কারণ। মানুষ চাওয়ামাত্র নিজের ইচ্ছা তাৎক্ষণিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে না। একে বিলম্বিত করতে হয়। কারণ মানুষের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা আছে। কোনোকিছু বাস্তবায়নের আগে তাকে নানা শর্ত পূরণ করতে হয়, যেগুলো হয়তো ঠিক সেই সময়ে উপস্থিত না-ও থাকতে পারে। আবার পরিবর্তন আসতে পারে মানুষের ইচ্ছার মধ্যেও। কিন্তু এর কোনোকিছুই ঈশ্বরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যার অর্থ, ঈশ্বর কোনোকিছু চাওয়ামাত্র তা অস্তিত্বে আসবে। তার মানে—ঈশ্বর যখন থেকে মহাবিশ্বের অস্তিত্ব চেয়েছেন, তখন থেকেই মহাবিশ্ব অস্তিত্বে আছে। আর ঈশ্বরের চাওয়ার মধ্যে যেহেতু কখনো পরিবর্তন হয় না, তাই তিনি সবসময়ই মহাবিশ্বের অস্তিত্ব চেয়েছেন। অর্থাৎ মহাবিশ্ব চিরন্তন।

আরও এগিয়ে গিয়ে অ্যারিস্টটল বলেছেন, নিজেকে ছাড়া অন্য কোনোকিছুর ব্যাপারে পরম সত্তার কোনো জ্ঞান নেই। কারণ ঈশ্বর কেবল সর্বোত্তম অস্তিত্বকে নিয়ে চিন্তা করতে পারেন, আর তিনি নিজেই সর্বোত্তম অস্তিত্ব।[3]

ঈশ্বরকে নিখুঁত প্রমাণ করতে গিয়ে অ্যারিস্টোটলের চেয়েও কয়েক ধাপ সামনে চলে গেছেন আরেক গ্রীক দার্শনিক প্লটিনস। তার মতে—ঈশ্বর সবকিছুর ঊর্ধ্বে, অস্তিত্বেরও ঊর্ধ্বে। ঈশ্বর তার নিজ সত্তার ব্যাপারেও জানেন না। তিনি এরও ঊর্ধ্বে।[4]

ঈশ্বরের একত্ব ও পরিপূর্ণতার ব্যাপারে দার্শনিকদের গড়ে তোলা ধ্যানধারণার মধ্যে এ হলো তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে ভালোগুলোর অবস্থা। চিন্তা করে দেখুন, তারা এমন এক ঈশ্বরের কথা বলছে, যার ব্যাপারে কোনোকিছুই বলা যায় না। বাস্তব পৃথিবীর সাথে এই ‘ঈশ্বর’-এর কোনো সম্পর্ক নেই। দার্শনিকদের এই পুরো পদ্ধতিটা তাত্ত্বিক, বিমূর্ত। তাদের চিন্তাধারা ওহির আলো থেকে বঞ্চিত। তারা এমন এক বিমূর্ত ঈশ্বরের ধারণা তৈরি করেছে, যার না বাস্তবতা আছে আর না আছে অস্তিত্ব।

বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেবল বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে স্রষ্টার একত্বের ধারণাকে বুঝতে গেলে ‘শুদ্ধতা’ ও ‘পরিপূর্ণতা’র এমন ধারণা মানুষ তৈরি করে, যা কেবল নেতিবাচকভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। সৃষ্টি, জানা, ইচ্ছা কিংবা ভালোবাসার মতো কোনো বৈশিষ্ট্যই তখন আর ঈশ্বরের সাথে যুক্ত করা যায় না। তারা পরিপূর্ণতার যে ধারণা তৈরি করেছে, এই বৈশিষ্ট্যগুলো যুক্ত হলে সেই ‘পরিপূর্ণতা’ নষ্ট হয়ে যায়। শেষমেশ তারা এমন এক উপসংহারে এসে পৌঁছায়, যা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবতাবিবর্জিত। তাদের পদ্ধতি পুরোপুরিভাবে অনুমান এবং তাত্ত্বিকতা নির্ভর। নিখুঁত ও পরিপূর্ণ প্রমাণ করতে গিয়ে তারা এক নিষ্ক্রিয় ও অক্ষম ঈশ্বরের ধারণা আবিষ্কার করেছে।

অন্যদিকে, ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ অনুযায়ী মহান আল্লাহ সক্রিয়। তাঁর পবিত্র বৈশিষ্ট্যসমূহ মহাবিশ্বের বাস্তব ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। মানুষের জীবন ও চারপাশের পৃথিবীতে মহান আল্লাহর বৈশিষ্ট্যসমূহের বাস্তব নিদর্শনের আলোচনা করে কুরআন।

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ মহাবিশ্বকে দেখে বাস্তবমুখীভাবে। এই মহাবিশ্বে আছে বস্তু, শরীর, রূপ, কাঠামো, গতি, শক্তি, উদ্ভিদ, প্রাণী এবং মানুষ। মহাবিশ্ব শরীর কিংবা কাঠামোহীন বিমূর্ত ধারণা নয়, মহাবিশ্ব কেবল নিরাকার ইচ্ছাশক্তি কিংবা নৈরাজ্য নয়। ‘পরম বুদ্ধিমত্তা’র মাঝে নিমজ্জিত রূপ আর ধারণার সমষ্টি নয় মহাবিশ্ব। মহাবিশ্ব স্রেফ প্রকৃতি নয়। মহাবিশ্ব কোনো আলেয়া, স্বপ্ন কিংবা

অনস্তিত্ব নয়। বরং মহাবিশ্ব হলো ওই বাস্তবতা, যার মাঝে মানুষের অবস্থান।

মহাবিশ্বকে তৈরি করেছেন মহান আল্লাহ। এর অস্তিত্ব আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি। কুরআন বারবার আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে মহাবিশ্বের মাঝে থাকা নিদর্শনের দিকে। আসমান-জমিন, গ্রহ-নক্ষত্র, খনিজসম্পদ, উদ্ভিদ,–-প্রাণী, দিন-রাতের আবর্তন, আলো-অন্ধকারের পরিবর্তন, ঝড়-বৃষ্টি-বিদ্যুৎসহ—মহাবিশ্বে যত ঘটনা বিরাজমান, তা নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে বলা হয়েছে কুরআনে। এই বাস্তবতার দিকে ইসলাম আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, কারণ এগুলো আল্লাহর একত্ব, ক্ষমতা, ইচ্ছা, জ্ঞান এবং রাজত্বের নিদর্শন। ইসলাম বলে না, মহাবিশ্ব মানুষের মনের তৈরি অথবা মহাবিশ্ব মানুষের মনের ভেতরে প্রতিচ্ছবি কেবল। বরং ইসলাম আমাদেরকে এই মহাবিশ্বের কাঠামো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলে। মহাবিশ্বের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, এর অস্তিত্ব কেবল আমাদের মনের ভেতরে নয়। আর এর উৎপত্তি ঘটিয়েছেন আল্লাহ। তিনি বলেছেন, 'কুন' (হও)…ফাইয়াকূন (আর তা হয়ে গেছে)। বাকি সৃষ্টির মতো মহাবিশ্বও তাঁর অনুগত গোলাম। আল্লাহ বলেছেন,

> সকল প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, আর সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার ও আলো। তারপরও কাফিররা তাদের রবের সমকক্ষ দাঁড় করায়। (সূরা আনআম, ৬ : ১)
>
> নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ। যিনি আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, তারপর আরশে উঠেছেন। তিনি সব বিষয় পরিচালনা করেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করার কেউ নেই। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদাত করো। তারপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? (সূরা ইউনুস, ১০ : ৩)
>
> তিনি সূর্যকে করেছেন দীপ্তিময় ও চাঁদকে আলোকময় এবং তার জন্য নির্দিষ্ট করেছেন মানযিল, যাতে তোমরা বছর গণনা ও সময়ের হিসাব জানতে পারো। আল্লাহ এগুলোকে যথাযথভাবেই সৃষ্টি করেছেন। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন বিস্তারিতভাবে। নিশ্চয় দিন ও রাতের আবর্তনে আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মাঝে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন, তাতে নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৫-৬)
>
> আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহকে ওপরে স্থাপন করেছেন খুঁটি ছাড়া, তোমরা তা দেখছো। তারপর তিনি আরশের ওপর উঠেছেন এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়মাধীন করেছেন; প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলবে। তিনি সব বিষয় পরিচালনা করেন, আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা দৃঢ়বিশ্বাসী হতে পারো তোমাদের রবের সাক্ষাতের ব্যাপারে। আর তিনিই জমিনকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বতমালা ও নদনদী। আর প্রত্যেক প্রকারের ফল তিনি সৃষ্টি করেছেন জোড়া জোড়ায়। তিনি রাত দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য। আর জমিনে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখণ্ড, আঙুর বাগান, শস্যক্ষেত্র, একই মূল বা ভিন্ন ভিন্ন মূল থেকে উদ্গত খেজুর গাছ, যেগুলো সেচ করা হয় একই পানি দ্বারা, আর স্বাদ-রূপের ক্ষেত্রে সেগুলোর কিছু সংখ্যককে আমরা কিছু সংখ্যকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি। নিশ্চয় বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন। (সূরা রা'দ, ১৩ : ২-৪)

আর আমি আসমানে স্থাপন করেছি গ্রহ-নক্ষত্ররাজি এবং দর্শকদের জন্য তা করে দিয়েছি সুসজ্জিত। (সূরা হিজ্‌র, ১৫ : ১৬)

আর জমিনকে আমি বিস্তৃত করেছি, তাতে সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছি; আর তাতে উৎপন্ন করেছি সকল প্রকার বস্তু সুনির্দিষ্ট পরিমাণে। তাতে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি তোমাদের, আর তাদেরও যাদের রিয্‌কদাতা তোমরা নও। এমন কোনো বস্তু নেই, যার ভান্ডার আমার কাছে নেই, আমি সেগুলো অবতীর্ণ করে থাকি আমার জ্ঞান মোতাবেক নির্দিষ্ট পরিমাণে। আমি প্রেরণ করি বৃষ্টি-সঞ্চারী বাতাস, অতঃপর আসমান থেকে পানি বর্ষণ করি আর তা তোমাদের পান করাই, তবে তোমরা তার সংরক্ষণকারী নও। আমিই জীবন দিই আর মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। (সূরা হিজ্‌র, ১৫ : ১৯-২৩)

আর আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন, তা থেকে তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন এবং তোমাদের জন্য পাহাড়ে আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন... (সূরা নাহ্‌ল, ১৬ : ৮১)

যারা কুফরি করে তারা কি দেখে না যে, আসমানসমূহ ও জমিন মিশে ছিল ওতপ্রোতভাবে, তারপর আমরা উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং প্রাণবান সবকিছু সৃষ্টি করলাম পানি থেকে; তবুও কি তারা ঈমান আনবে না? আর পৃথিবীতে আমি স্থাপন করেছি সুদৃঢ় পর্বত, যাতে পৃথিবী তাদেরকে নিয়ে নড়াচড়া না করে। আর তাতে সৃষ্টি করেছি প্রশস্ত পথ, যাতে তারা পথ পেতে পারে। আর আমি আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ। কিন্তু এ সবের নিদর্শন থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য ও চাঁদ; প্রত্যেকেই বিচরণ করে নিজ নিজ কক্ষপথে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৩০-৩৩)

...আর আপনি ভূমিকে দেখুন শুষ্ক, অতঃপর যখনই আমি তাতে পানি বর্ষণ করি, তখন তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদ্‌গত করে সকল প্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ। এটি এজন্য যে, আল্লাহই সত্য আর তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন এবং সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান তিনিই। কিয়ামাত আসবেই, এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং কবরে যারা আছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের পুনরুত্থিত করবেন। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৫-৭)

আপনি কি দেখতে পান না, পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তিনি মানুষের কল্যাণ-কাজে লাগিয়ে রেখেছেন। আর নৌযানগুলো সমুদ্রে চলাচল করে তাঁর হুকুমেই? তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন, যাতে তা পৃথিবীতে পতিত না হয় তাঁর অনুমতি ছাড়া। আল্লাহ মানুষের প্রতি নিশ্চিতই বড়ই করুণাশীল, বড়ই দয়াবান। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৬৫)

আর অবশ্যই আমি তোমাদের ঊর্ধ্বে সৃষ্টি করেছি সাতটি আসমান এবং আমি সৃষ্টির বিষয়ে মোটেই উদাসীন নই। আমি আকাশ থেকে পরিমিত বৃষ্টি বর্ষণ করি, অতঃপর আমি তা সংরক্ষণ করি জমিনে। আর অবশ্যই আমি সেটাকে অপসারণ করতেও সক্ষম। তারপর তা দ্বারা আমি তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙুরের বাগানসমূহ সৃষ্টি করেছি। তাতে থাকে তোমাদের জন্য প্রচুর ফল। আর তা থেকেই তোমরা খাও। (সূরা মুমিনূন, ২৩ : ১৭-১৯)

আপনি কি দেখেন না—,আল্লাহ আকাশ হতে বৃষ্টিপাত করেন, তারপর তা দিয়ে আমি বিচিত্র বর্ণের ফলমূল উৎপাদন করি

আর পাহাড়ের মধ্যে রয়েছে বিচিত্র বর্ণের পথ; শুভ্র, লাল ও নিকষ কালো। এমনিভাবে মানুষ, বিচরণশীল প্রাণী ও চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যেও রয়েছে নানা বর্ণ। বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল। (সূরা ফাতির, ৩৫ : ২৭-২৮)

তারা কি তাদের ওপরে অবস্থিত আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখে না, কীভাবে আমি তা নির্মাণ করেছি, তাকে সুশোভিত করেছি এবং তাতে কোনো ফাটলও নেই? আমি জমিনকে বিস্তৃত করেছি, তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা এবং তাতে প্রত্যেক প্রকারের সুদৃশ্য উদ্ভিদ উদ্‌গত করেছি, আল্লাহ অভিমুখী প্রতিটি বান্দার জন্য জ্ঞান ও উপদেশ হিসেবে। আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি কল্যাণকর বৃষ্টি। আর তা দ্বারা উৎপন্ন করি বাগ-বাগিচা ও কর্তনযোগ্য শস্যদানা। আর উঁচু খেজুর গাছ, যাতে আছে খেজুর গুচ্ছ স্তরে স্তরে সাজানো, আমার বান্দাদের জন্য রিযকস্বরূপ। আর আমি পানি দ্বারা মৃত শহর সঞ্জীবিত করি। এভাবেই বের করা হবে (কবর থেকে মানুষদের)। (সূরা ক্বাফ, ৫০ : ৬-১১)

অতি মহান ও শ্রেষ্ঠ তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব ও রাজত্ব যাঁর হাতে; তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য—কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম? তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতিশয় ক্ষমাশীল। যিনি সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে। পরম করুণাময়ের সৃষ্টিতে আপনি কোনো অসামঞ্জস্য দেখতে পাবেন না। আপনি আবার তাকিয়ে দেখুন, কোনো ত্রুটি দেখতে পান কি? তারপর আপনি দ্বিতীয়বার দৃষ্টি ফেরান, সে দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে আপনার কাছে। আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুসজ্জিত করেছি প্রদীপমালা দিয়ে, সেগুলোকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি। (সূরা মুল্‌ক, ৬৭ : ১-৫)

আপনি কি আপনার রবের প্রতি লক্ষ করেন না, কীভাবে তিনি ছায়া সম্প্রসারিত করেন? তিনি চাইলে ছায়াকে অবশ্যই স্থির রাখতে পারতেন। সূর্যকেই আমি করেছি তার (অর্থাৎ ছায়ার) নির্দেশক। অতঃপর আমি তাকে নিজের দিকে গুটিয়ে নিই, ধীরে ধীরে ক্রমাগতভাবে।

তিনিই তোমাদের জন্য রাতকে করেছেন আবরণ, নিদ্রাকে করেছেন আরামপ্রদ আর দিনকে করেছেন (নিদ্রারূপী সাময়িক মৃত্যুর পর) আবার জীবন্ত হয়ে ওঠার সময়। আর তিনিই তাঁর রহমতের বৃষ্টির আগে সুসংবাদবাহীরূপে বায়ু প্রেরণ করেন এবং আমি আকাশ হতে পবিত্র পানি বর্ষণ করি, যা দিয়ে মৃত জমিনকে আমি জীবিত করে তুলি এবং তৃষ্ণা নিবারণ করি আমার সৃষ্টির অন্তর্গত অনেক জীবজন্তুর ও মানুষের। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৪৫-৪৯)

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ মহাবিশ্বের ব্যাপারে বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে। ইসলাম হিন্দু ধর্মের মতো বস্তুজগতের ওপর কাল্পনিক বৈশিষ্ট্য চাপিয়ে দেয় না। হিন্দু ধর্মে বলা হয়, সত্যিকারের অস্তিত্ব আছে কেবল দেবতা ব্রহ্মার। বস্তুজগৎ হলো নাস্তি, সত্তাহীনতা। কিন্তু সত্তাহীনতার সাথে সত্তা মিশে গেছে। যার ফলে দুনিয়াতে দেখা দিয়েছে মন্দ ও কলুষতা। সত্তা হলো পরম কল্যাণ এবং পরিপূর্ণতা। নাস্তি হলো পরম মন্দ এবং ত্রুটি। এই মন্দকে ধ্বংস করার মধ্যে মানুষের মুক্তি নিহিত। শরীরকে ধ্বংস করে বিশুদ্ধ অস্তিত্বে ফিরে গেলেই কেবল বস্তুর বন্দিত্ব থেকে মানুষ নিজেকে মুক্ত করতে পারবে।

ইতিপূর্বে আলোচিত গ্রীক দার্শনিকদের চিন্তাধারার কথাও বিবেচনা করা যেতে পারে। প্লেটোর মতে, আমাদের চারপাশের বাস্তবতা হলো—পরম বুদ্ধিমত্তার মাঝে থাকে পরম আদর্শ ও রূপের ছায়া কেবল। আমাদের সামনে থাকা গাছগুলো আদর্শের জগতে থাকা পরম গাছের ছায়া, ত্রুটিপূর্ণ অনুকরণ।

প্লটিনসের মতে, ঈশ্বর হলো পরম একক। তার থেকে বিচ্ছুরিত হয় বুদ্ধিমত্তা (Nous)। আর পরম বুদ্ধিমত্তা থেকে বিচ্ছুরিত হয় 'আত্মা'। আর এই 'আত্মাই' মহাবিশ্বকে তৈরি করেছে। মহাবিশ্ব অস্তিত্বের নিকৃষ্টতম স্তর। অন্ধকার, কলুষতা আর মন্দে পরিপূর্ণ।

এসবই মানুষের খেয়ালখুশি আর জল্পনাকল্পনার ফল। আমাদের দেখা দুনিয়ার সাথে এগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। পর্যবেক্ষণ~~ন~~ ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে এগুলো কোনো ভিত্তি পাওয়া যায় না। এসব ধ্যানধারণার সাথে ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ এবং এ ব্যাপারে কুরআনে আসা বক্তব্যের তুলনা করে দেখুন।

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ মানুষকে দেখে বাস্তবমুখীভাবে। মানুষের বিমূর্ত, কাল্পনিক কোনো ধারণা নিয়ে ইসলাম কাজ করে না। বাস্তব পৃথিবীর মানুষের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃতি থাকে। মানুষ রক্ত, মাংস, পেশি ও হাড়ে গড়া। তার আছে মন, বুদ্ধিমত্তা, ব্যক্তিত্ব এবং আত্মা। প্রত্যেক মানুষের চাহিদা, কামনাবাসনা আছে। মানুষ জন্মায়, খায়, হাঁটে, ~~জন্মায়,~~ মারা যায়। তার জীবনের শুরু ও শেষ আছে। মানুষ প্রভাবিত হয় এবং প্রভাবিত করে। মানুষ দান করে, গ্রহণও করে। মানুষ ভালোবাসে, ঘৃণা করে; আশাবাদী হয়, ভয় পায়; তার উত্থান ও পতন ঘটে। সে বিশ্বাস করে, সে অস্বীকার করে। সে সোজা পথে হাঁটে, আবার ~~সে~~ পথ হারায়। সে ভাঙে এবং ~~সে~~ গড়ে; সে জয় করে ও হত্যা করে। মানুষের মাঝে ভালো ও মন্দ নানা ধরনের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান এবং ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ সবগুলো বৈশিষ্ট্যকে আমলে নেয়। আল্লাহ বলেছেন,

> হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সেই দুজন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা পরস্পর পরস্পরের নিকট (হক) চেয়ে থাকো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারেও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষক। (সূরা নিসা, ৪ : ১)

> হে মানুষ! আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে, আর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অন্যের সাথে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই বেশি মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে বেশি তাকওয়াসম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত। (সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১৩)

> পবিত্র ও মহান সে সত্তা, যিনি সকল জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন, জমিন যা উৎপন্ন করেছে তা থেকে, মানুষের নিজেদের মধ্য থেকে এবং সে সবকিছু থেকেও, যা তারা জানে না। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৩৬)

> আর অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির নির্যাস থেকে। অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দু রূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। অতঃপর আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাট বাঁধা রক্তে, অতঃপর জমাট বাঁধা রক্তকে পরিণত করি মাংসপিণ্ডতে, অতঃপর মাংসপিণ্ডকে পরিণত করি হাড্ডিতে, তারপর হাড্ডিকে আবৃত করি মাংস দিয়ে, অতঃপর তাকে

উন্নীত করি এক নতুন সৃষ্টিতে। অতএব (দেখে নিন) সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কতই না মহান! (সূরা মুমিনূন, ২৩ : ১২-১৪)

মহাকালের মধ্য হতে মানুষের ওপর এমন একটা সময় কি অতিবাহিত হয়নি, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না? আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে, আমি তাকে পরীক্ষা করব, ফলে আমি তাকে বানিয়েছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। অবশ্যই আমি তাকে পথ প্রদর্শন করেছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে হবে অকৃতজ্ঞ। (সূরা ইনসান, ৭৬ : ১-৩)

মানুষ ধ্বংস হোক, সে কতই না অকৃতজ্ঞ! আল্লাহ তাকে কোন বস্তু হতে সৃষ্টি করেছেন? শুক্রবিন্দু হতে। তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে সুগঠিত করেছেন। অতঃপর তিনি (উপায়-উপকরণ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে জীবনে চলার জন্য) তার পথ সহজ করে দিয়েছেন। (সূরা আবাসা, ৮০ : ১৭-২০)

আর মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে, তখন সে শুয়ে, বসে বা দাঁড়িয়ে আমাদেরকে ডেকে থাকে। অতঃপর আমরা যখন তার দুঃখ-দৈন্য দূর করি, তখন সে এমনভাবে চলতে থাকে যেন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করার পর সে আমাদেরকে ডাকেইনি। এভাবে সীমালঙ্ঘনকারীদের কাজ তাদের কাছে শোভনীয় করে দেওয়া হয়েছে। (সূরা ইউনুস, ১০ : ১২)

আর দুঃখদুর্দশা স্পর্শ করার পর যখন আমি মানুষকে রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই, তখন তারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়। বলুন, 'আল্লাহ কৌশল অবলম্বনে আরও বেশি দ্রুততর।' নিশ্চয় তোমরা যে কূটকৌশল করো, তা আমাদের ফেরেশতারা লিখে রাখে। (সূরা ইউনুস, ১০ : ২১)

আমি যদি মানুষকে আমার পক্ষ থেকে রহমত আস্বাদন করাই, অতঃপর তা তার থেকে ছিনিয়ে নিই, তখন সে অবশ্যই হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে। আর দুঃখদুর্দশা স্পর্শ করার পর যদি আমি তাকে নিয়ামাত আস্বাদন করাই, তাহলে সে অবশ্যই বলবে, 'আমার থেকে বিপদাপদ দূর হয়ে গেছে,' আর সে হবে অতি উৎফুল্ল, অহংকারী। তবে যারা সবর করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্যই রয়েছে ক্ষমা ও মহা প্রতিদান। (সূরা হূদ, ১১ : ৯-১১)

আর মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে, পার্থিব জীবনে যার কথাবার্তা আপনাকে চমৎকৃত করে এবং তার অন্তরে যা আছে, সে সম্বন্ধে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে। প্রকৃতপক্ষে সে ভীষণ কলহপ্রিয়। আর যখন সে প্রস্থান করে, তখন সে জমিনে অশান্তি সৃষ্টি এবং শস্যক্ষেত্র ও প্রাণী ধ্বংসের চেষ্টা করে। আর আল্লাহ ফাসাদ ভালোবাসেন না। (সূরা বাকারা, ২ : ২০৪-২০৫)

মানুষ সত্যিকার অর্থে যেমন, ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ তাকে দেখে সেভাবেই। মানুষের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য আর খেয়ালখুশি থাকে। সহজ ভাষায়, মানুষ কোনো বিমূর্ত কল্পনা নয়। বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো তাত্ত্বিকতা নয়। মানুষ রক্ত-মাংস, আবেগ-অনুভূতি, আত্মা ও প্রবৃত্তি দিয়ে গড়া বাস্তবতা। মানবতা নামের বিমূর্ত ধারণা নিয়ে ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ কাজ করে না। যদিও বস্তুবাদের দর্শন বর্তমানে মানবতাকে অনেকটা দেবতার পর্যায় নিয়ে গেছে।[5]

ফিকটের ভাববাদী দর্শনের মতো 'পরম বুদ্ধিমত্তা' নিয়েও কাজ করে না ইসলাম। পরম বুদ্ধিমত্তার বাস্তব কোনো অস্তিত্ব নেই।

বাস্তবে আছে নির্দিষ্ট মানুষ আর তাদের নির্দিষ্ট বুদ্ধিমত্তা। প্লটিনসের নিওপ্লেটোনিসমে বলা হয়, প্রথমে পরম একক (One), তারপর তা থেকে বুদ্ধিমত্তা (Nous), আর তা থেকে আত্মার (Soul) উৎপত্তি। আত্মা মহাবিশ্বের স্রষ্টা। এমন কোনোকিছুও ইসলাম বলে না।[6]

ভাববাদ বা আইডিয়ালিসমের দর্শন কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক ক্যাটাগরি বা শ্রেণি নিয়ে আলোচনা করে। মানুষের জীবনে সক্রিয় সত্যিকারের শক্তিগুলো নিয়ে এখানে কোনো আলোচনা নেই। দৃষ্টবাদ বা পসিটিভিসম মানবীয় বুদ্ধিমত্তা এবং ইন্দ্রিয় অনুভূতির স্রষ্টা বানায় প্রকৃতিকে।

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ বলে মহান আল্লাহ হলেন স্রষ্টা। বস্তুজগতের ঘটনা ও নিয়ম মানবীয় বুদ্ধিমত্তা অনুধাবন করতে পারে। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মাধ্যমে পারে প্রাকৃতিক বিধান ও নিয়মনীতি আবিষ্কার করতে। বুঝতে পারে মহাবিশ্বে ক্রিয়ারত বিভিন্ন শক্তিকে। বস্তুজগৎ থেকে মানুষ ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতি ও তথ্য সংগ্রহ করতে পারে এবং ~~মানুষ~~ বস্তুজগৎকে প্রভাবিত করতে পারে।

আইডিয়ালিসম (ভাববাদ), পসিটিভিসম (দৃষ্টবাদ), ডায়ালেকটিক ম্যাটেরিয়ালিসম (দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ)-এর মতো দর্শন আর চিন্তাধারাগুলোর আবির্ভাব কুরআন নাযিল হবার শত শত বছর পর। কিন্তু অনুমাননির্ভর এসব চিন্তাভাবনা আর দর্শনের ফলে মানুষ চিন্তা ও বিশ্বাসগত যে বিপর্যয়ে আক্রান্ত হবে, ইসলাম যেন শুরু থেকেই তার পূর্বাভাস দিয়েছিল। তাই মানবরচিত মতাদর্শগুলোর প্রান্তিকতা ও সীমাবদ্ধতার বদলে ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউতে পাওয়া যায় ভারসাম্য, পরিপূর্ণতা এবং ব্যাপকতা। তাই এই ওয়ার্ল্ডভিউয়ের মাঝে মানুষের বিবেক প্রশান্তি খুঁজে পায় যেকোনো পরিস্থিতিতে। যেকোনো সময়ে সে ইসলামের কাছে ফিরে আসতে পারে অনুপ্রেরণা এবং হিদায়াতের জন্য। মানবরচিত বাদ মতবাদের মরুপ্রান্তর আর ধ্বংসস্তূপ থেকে সে ফিরে আসতে পারে ইসলামের নিরাপত্তার ছায়ায়। আল্লাহ সর্বশক্তিমান বলেছেন,

> নিশ্চয়ই এ কুরআন সেই পথ দেখায়, যা সোজা ও সুপ্রতিষ্ঠিত...(সূরা ইসরা, ১৭ : ৯)

> আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানায় এবং সৎকাজ করে। আর বলে, 'অবশ্যই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।' (সূরা ফুসসিলাত, 41 : 33)

মানবজীবন ও মানবসমাজের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের ব্যাপারে ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের পদ্ধতি থেকে বাস্তবমুখিতার আরেকটি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ মানুষের জন্য জীবনের একটি নির্দিষ্ট পথ ঠিক করে। এই পথ মানুষের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তার পারিপার্শ্বিকতা এবং সক্ষমতার সাথে ভারসাম্যপূর্ণ। একটু আগেই আমরা বলেছি, ইসলাম 'মানবতা'র মতো বিমূর্ত কোনো ধারণার কথা বলে না। ইসলাম সত্যিকারের মানুষের কথা বলে। মানুষ কোনো বিমূর্ত সত্তা নয়, যে সবসময় যৌক্তিক, যাকে সবসময় বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। আবার ইসলাম মানুষকে নিকৃষ্টের চেয়েও নিকৃষ্ট মনে করে না। ইসলাম মানুষকে দেখে না অন্ধ প্রকৃতির সৃষ্টি কিংবা অর্থনৈতিক শক্তির হাতের পুতুল হিসেবে।

মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে। মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে মহান আল্লাহর ইবাদাতের জন্য। যাতে আল্লাহর খলীফা হিসেবে ইতিবাচক ভূমিকা রেখে মানুষ তার দায়িত্ব পালন করে। প্রাণী, উদ্ভিদ, অন্য মানুষ

কিংবা পৃথিবীর বস্তুগত সম্পদ—সবকিছুর প্রতি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। এই দায়িত্ব এবং কর্তব্য বাস্তবায়নের জন্য তাকে সক্রিয় হতে হয়, উৎপাদনশীল হতে হয়, চালু করতে হয় নতুন নতুন কর্মপ্রক্রিয়া।

মানুষ একই সাথে বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক জীব। মানুষের জন্য ইসলামের নির্ধারিত পথ বাস্তবসম্মত। ইসলামি জীবনব্যবস্থা মানুষের শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক বাস্তবতার সাথে খাপ খায়। এটি মানুষের সীমাবদ্ধতা ও শক্তিগুলোর সাথে মানানসই। মানুষের দৈহিক চাহিদা এবং তার মানসিক ও আধ্যাত্মিক গঠনকেও আমলে নেয় ইসলাম। এই ব্যবস্থা গতিশীল, বাস্তবমুখী এবং সম্পূর্ণভাবে মানবপ্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

ইসলাম যে জীবনব্যবস্থা কামনা করে, তা কখনই অবাস্তব নয়, ইউটোপিয়ান নয়। বরং এই জীবন আছে প্রত্যেক মানুষের হাতের নাগালেই। এই জীবনব্যবস্থা এসেছে মাটির এ পৃথিবীতে বসবাস করা মানুষের জন্যই। ওই মানুষ—, যাকে জীবিকা অর্জন করতে হয়, বাজারে যেতে হয়, বিয়ে করতে হয়, সন্তান জন্ম দিতে হয়, যাকে কাজ করতে হয়, যার প্রয়োজন হয় বিনোদনের, যে ভালোবাসতে পারে এবং ঘৃণা করতে পারে। যে ভয় পায় ও আশাবাদী হয়। এ সবই মানবীয় বৈশিষ্ট্য। আর এই মানুষের জন্যই ইসলাম এসেছে।

পৃথিবীতে মানুষের ভূমিকাকে ইসলামে তুচ্ছ করা হয় না। আবার মানুষকে দেবতা কিংবা ফেরেশতার পর্যায়ে ওঠানো হয় না, যেখানে মানুষ মানেই আলো আর কল্যাণ;- সে শারীরিক প্রয়োজন আর কামনাবাসনা থেকে মুক্ত। এমন অবাস্তবভাবে ইসলামমুসলিমরা মানুষকে দেখে না।

এখানে আমরা কুরআনের কিছু আয়াত তুলে ধরছি, যেগুলো থেকে মানবপ্রকৃতির সাথে ইসলামি জীবনব্যবস্থার সঙ্গতির বিষয়টি স্পষ্ট হয়। এই ব্যবস্থা মানুষকে সবসময় পবিত্রতা এবং বিশুদ্ধতার দিকে চালিত করে। যেহেতু শুধু ইসলামই মানবপ্রকৃতির সবগুলো দিক আমলে নেয়, তাই ইসলামের অনুসরণই মানুষকে উৎকর্ষের সেই দিগন্তের দিকে চালিত করে, যা ছোঁয়ার সামর্থ্য তার আছে। আল্লাহ বলেছেন,

> তারা বলে, 'এ কেমন রাসূল, যে খাওয়া-দাওয়া করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে; তার কাছে একজন ফেরেশতা পাঠানো হলো না কেন, যে তার সাথে থাকত সতর্ককারীরূপে? অথবা তাকে ধনভাণ্ডার ঢেলে দেওয়া হয় না কেন, অথবা তার জন্য একটি বাগান হয় না কেন, যা থেকে সে খেতে পারে?' জালিমরা আরও বলে, 'তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছো।' দেখুন, তারা আপনার কী উপমা দেয়! ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, অতএব তারা পথ পাবে না কোনোক্রমেই ।
>
> মহা কল্যাণময় তিনি, যিনি ইচ্ছে করলে আপনাকে দিতে পারেন এর চেয়েও উৎকৃষ্ট বস্তু —বাগ-বাগিচা, যার নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে নির্ঝরিণী, দিতে পারেন তিনি আপনাকে প্রাসাদরাজি। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৭-১০)
>
> আর তারা বলে, 'কখনো আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য জমিন থেকে একটি ঝরনধারা প্রবাহিত করবে। কিংবা (যতক্ষণ না) তোমার খেজুর ও আঙুরের বাগান হবে, যার ফাঁকে ফাঁকে তুমি ঝরনা

প্রবাহিত করবে অজস্র ধারায়। অথবা (যতক্ষণ না) তুমি আকাশকে টুকরো টুকরো করে আমাদের ওপর ফেলবে, যেমনটা তুমি বলে থাকো (যে তা ঘটবে) কিংবা আল্লাহ আর ফেরেশতাগণকে সরাসরি আমাদের সামনে এনে দেবে। অথবা তোমার একটি সোনার তৈরি ঘর হবে অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে, কিন্তু তোমার আকাশ আরোহণেও আমরা কখনো ঈমান আনব না, যতক্ষণ তুমি আমাদের প্রতি এক কিতাব নাযিল না করবে, যা আমরা পাঠ করব।'

বলুন, 'পবিত্র মহান আমার রব! আমি তো একজন মানব-রাসূল ছাড়া কিছু নই?' (সূরা ইসরা, ১৭ : ৯০-৯৩)

আল্লাহ কোনো ব্যক্তির ওপর তার সাধ্যাতীত কিছু আরোপ করেন না, সে ভালো যা উপার্জন করে, তার প্রতিফল তারই। আর মন্দ যা কামাই করে, তার প্রতিফল তার ওপরই বর্তায়...(সূরা বাকারা, ২ : ২৮৬)

আর তারা আপনাকে রজঃস্রাব (হায়েজ) সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। বলুন, তা কষ্ট ও অশুচি। কাজেই তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রী-সঙ্গম থেকে বিরত থাকো এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত (সঙ্গমের জন্য) তাদের নিকটবর্তী হবে না। তারপর তারা যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হবে, তখন তাদের নিকট ঠিক সেভাবে গমন করবে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালোবাসেন এবং তাদেরকেও ভালোবাসেন, যারা পবিত্র থাকে। তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছে, গমন করতে পারো। আর নিজেদের জন্য ভবিষ্যতের বন্দোবস্ত করো এবং আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রেখো, তোমরা অবশ্যই আল্লাহর সম্মুখীন হবে। আর মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন। (সূরা বাকারা, ২ : ২২২-২২৩)

তোমাদের ওপর লড়াইয়ের বিধান দেওয়া হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। হতে পারে কোনো বিষয় তোমরা অপছন্দ করছো, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে কোনো বিষয় তোমরা পছন্দ করছো, অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না। (সূরা বাকারা, ২ : ২১৬)

মানুষের কাছে সুশোভিত করা হয়েছে নারী, সন্তান, স্তূপীকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যভাণ্ডার, চিহ্নযুক্ত অশ্বরাজি, গৃহপালিত পশু এবং শস্যক্ষেত্র; এসবই পার্থিব জীবনের সম্পদ। আর আল্লাহ, তাঁরই নিকট রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।

বলুন, 'আমি কি তোমাদেরকে এসব বস্তু থেকে উৎকৃষ্টতর কোনোকিছুর সংবাদ দেবো? যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ, যার পাদদেশে প্রবাহিত হয় নদী। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল, পবিত্র স্ত্রীগণ এবং আল্লাহর নিকট থেকে সন্তুষ্টিসহ। আর আল্লাহ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা। (সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৪-১৫)

তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে, যার বিস্তৃতি হচ্ছে আসমানসমূহ ও জমিনের সমান, যা প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে, যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ মুহ্সিনদেরকে ভালোবাসেন। যারা কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবে? আর তারা যা করেছে, জেনে শুনে তারা বারবার তা করে না। এরাই তারা, যাদের জন্য রয়েছে

তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ক্ষমা এবং এমন এক জান্নাত, যার নিম্নে ঝরনাধারা প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কতই না উত্তম! (সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৩৩-১৩৬)

পুরুষরা নারীদের কর্তা, কারণ আল্লাহ তাদের একেকে অপরের ওপর মর্যাদা দিয়েছেন এবং এজন্য যে, পুরুষ তাদের ধনসম্পদ ব্যয় করে। ফলে পুণ্যবতী স্ত্রীরা (আল্লাহ ও স্বামীর প্রতি) অনুগতা থাকে এবং পুরুষের অনুপস্থিতিতে আল্লাহ যা সংরক্ষণ করতে আদেশ দিয়েছেন, (অর্থাৎ তাদের সতীত্ব ও স্বামীর সম্পদ) তারা তা সংরক্ষণ করে। যদি তাদের মধ্যে অবাধ্যতার সম্ভাবনা দেখতে পাও, তাদেরকে সদুপদেশ দাও এবং তাদের সাথে শয্যা বন্ধ করো এবং তাদেরকে (সঙ্গতভাবে) প্রহার করো। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ অন্বেষণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, মহান। (সূরা নিসা, ৪ : ৩৪)

সুতরাং যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে, তারা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই (কিতাল) করুক। আর যে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই (কিতাল) করবে, সে নিহত হোক কিংবা বিজয়ী, অচিরেই আমি তাকে দেবো মহা পুরস্কার।

আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছো না! অথচ দুর্বল নারী, পুরুষ ও শিশুরা বলছে, 'হে আমাদের রব!- আমাদেরকে এ জনপদ থেকে বের করুন, যার অধিবাসীরা জালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে নির্ধারণ করুন একজন অভিভাবক। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী।'

যারা মুমিন, তারা আল্লাহর পথে লড়াই (কিতাল) করে। আর যারা কাফির, তারা লড়াই (কিতাল) করে তাগূতের পথে। কাজেই তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে লড়াই করো; নিশ্চয় শয়তানের কৌশল দুর্বল। (সূরা নিসা, ৪ : ৭৪-৭৬)

হে মুমিনগণ!- তোমরা আল্লাহর পথে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান থাকো ন্যায়ের সাক্ষ্যদাতা হিসেবে, কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা তোমাদেরকে যেন সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা সুবিচার করবে, এটা তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো। নিশ্চয় তোমরা যা করো, আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৮)

হে বনী আদম! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পোশাক গ্রহণ করো। আর খাও এবং পান করো; কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।

বলুন, 'আল্লাহ নিজের বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, তা কে হারাম করেছে?' বলুন, 'পার্থিব জীবনে, বিশেষ করে কিয়ামাতের দিনে এ সব তাদের জন্য, যারা ঈমান আনে।' এভাবে আমরা জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করি। বলুন, 'নিশ্চয় আমার রব হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা। আর পাপ ও অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন এবং কোনোকিছুকে আল্লাহর শরীক করা, যার কোনো সনদ তিনি নাযিল করেননি। আর আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা, যা তোমরা জানো না।' (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৩১-৩৩)

এই আয়াতগুলো এবং কুরআনের এমন আরও অনেক আয়াত; যেখানে বিভিন্ন দায়িত্ব বা নিষেধাজ্ঞার কথা এসেছে, ইসলামি জীবনব্যবস্থার বাস্তবমুখিতা ও প্রয়োগ-যোগ্যতার প্রমাণ দেয়। আমরা যতই কুরআনের দিকে তাকাই, ততই এর মাঝে নিহিত গভীর প্রজ্ঞা ও বাস্তবমুখিতা আমাদের বিস্মিত করে। এই জীবনব্যবস্থা মানবপ্রকৃতির সাথে মানানসই। এ জীবনব্যবস্থা মানুষের কাছ থেকে এমন কিছু দাবি করে না, যা তার সাধ্যের বাইরে অথবা তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

হিন্দু ধর্ম তার অনুসারীদের এমন সবকিছু থেকে বিরত থাকতে বলে, যা তাদের শরীরী অস্তিত্বকে শক্তিশালী করবে। কারণ শরীর নামের খাঁচার মধ্যে মানুষের আত্মা বন্দি হয়ে আছে। যতক্ষণ না মানুষ শরীর নামের খাঁচা থেকে তার আত্মাকে মুক্ত করতে পারবে, ততক্ষণ সে পৌঁছাতে পারবে না প্রকৃত অর্থে কল্যাণময়, নিখুঁত সেই সত্তায়।

খ্রিষ্টীয় চার্চের শিক্ষার দিকে তাকালে দেখা যায়, বেশিরভাগ খ্রিষ্টান মানুষকে শরীর ও আত্মার একটা মন্দ মিশ্রণ হিসেবে দেখে। তারা মনে করে আত্মা বিশুদ্ধ। অন্যদিকে শরীর অবিশুদ্ধ, নোংরা। কাজেই মানুষকে এই মন্দ মিশ্রণ থেকে মুক্ত করতে হবে। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির ফলে তারা অনুসারীদের কাছ থেকে এমন সব জিনিস দাবি করে, যেগুলো তাদের সাধ্যের বাইরে অথবা মানবপ্রকৃতির সাথে সাংঘর্ষিক। যেমন ক্যাথলিক চার্চের অবস্থান অনুযায়ী ডিভোর্স বা তালাক জায়িয নয়। আর কোনোভাবে ডিভোর্স হয়ে গেলেও সাবেক স্বামী বা স্ত্রীর জীবদ্দশায় দ্বিতীয় বিয়ে জায়িয নয়। খ্রিষ্টীয় চার্চের এমন অনেক শিক্ষা আছে, যা মানবপ্রকৃতির সাথে সাংঘর্ষিক।

নিশ্চয় ইসলাম একটি বাস্তবমুখী ধর্ম। এই ধর্ম ইতিবাচক, প্রাণবন্ত। এই ধর্মের বিধানগুলো মানবপ্রকৃতির সাথে এবং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে দেওয়া দায়িত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এই দ্বীন মানুষের সব প্রতিভা এবং ক্ষমতাকে যথাযথভাবে শক্তি জোগায়। একইসাথে ইসলাম বলে অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের মাধ্যমে ব্যক্তিগত উৎকর্ষের কথা। তবে এজন্য ইসলাম মানুষকে তার স্বাভাবিক প্রবণতা আর প্রয়োজনগুলোকে দমিয়ে রাখতে বলে না, বরং ইসলাম এগুলোকে ইতিবাচকভাবে কাজে লাগানোর কাঠামো তৈরি করে দেয়। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের বাস্তবমুখিতার বৈশিষ্ট্য ইসলামি আকীদা ও জীবনব্যবস্থা—দুই ক্ষেত্রেই কার্যকর। এগুলো গড়ে উঠেছে মানুষ এবং মানুষের জীবনের ব্যাপারে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তির ওপর। তাই ইসলামি আকীদা এবং ইসলামি আচরণের মধ্যে পরিপূর্ণ সংগতি বিদ্যমান।

ইসলাম মানুষকে স্বাধীনতা দেয় পৃথিবী জুড়ে অন্বেষণ চালাতে তার সব সামর্থ্য দিয়ে। ইসলাম মানুষকে স্বাধীনতা দেয় পৃথিবীতে থাকা নিয়ামাতগুলো কাজে লাগাতে, সম্পদগুলোকে আরও সমৃদ্ধ করতে। মানুষের সামনে ইসলাম আকীদাগত কিংবা বিধানগত কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে না। ইসলামি আকীদা ও জীবনব্যবস্থা মহাবিশ্বের বিরাজমান ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ এই সবকিছু এসেছে একই মহান ও পবিত্র উৎস থেকে। সেই উৎস থেকে, যিনি দুনিয়াতে সফল হবার জন্য যোগ্যতা এবং সক্ষমতা মানুষকে দিয়েছেন।

তাই ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ এবং তা থেকে উৎসারিত ইসলামি জীবনব্যবস্থাকে অনুধাবন করা ব্যক্তিরা গবেষণা, অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও অভিযানের মাধ্যমে পৃথিবীতে নানা কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে পরিপূর্ণভাবে। তবে তারা তা করে ইসলাম থেকে শেখা মূল্যবোধ, মাপকাঠি এবং মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। এমন মানুষ তার সব কাজ ওই বৈশিষ্ট্যগুলো অনুযায়ী করার চেষ্টা করে, যেগুলো

ইসলাম তাকে শেখায়; অর্থাৎ ভারসাম্য, ব্যাপকতা, ইতিবাচকতা এবং বাস্তবমুখিতা।

কাজেই আপনি একনিষ্ঠ হয়ে নিজ মুখমণ্ডলকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত রাখুন। আল্লাহর ফিতরাত (স্বাভাবিক রীতি বা দ্বীন ইসলাম) যার ওপর (চলার যোগ্য করে) তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই প্রতিষ্ঠিত দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। (সূরা রূম, ৩০ : ৩০)

---

[1] আল-আক্কাদ : আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ (মৃ. ১৯৬৪), মিশরীয় কবি, সাংবাদিক এবং সাহিত্য সমালোচক। আল-আক্কাদ মিশরীয় ওয়াফদ পার্টির সদস্য ছিলেন। প্রথম জীবনে সাইয়্যিদ কুতুব আল-আক্কাদের চিন্তা দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ছিলেন। (অনুবাদক)

[2] আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ, আল্লাহ্, পৃষ্ঠা ১১৭।

[3] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৯-১৪০।

[4] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৭-১৮৮।

[5] যেমনটা অগুস্ত কন্টের মতো পসিটিভিস্টদের চিন্তাধারায় দেখা যায়।

[6] প্লটিনসের দর্শনের বিচ্ছুরণ বা Emanation এই ধারণা দ্বারা ইয়াহূদি ও খ্রিষ্টধর্মের বিভিন্ন ধারা প্রভাবিত হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন পৌত্তলিক, নস্টিক (gnostic) এবং রহস্যবাদী (hermetic) ধারাও ব্যাপকভাবে প্লটিনসের দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। দুঃখজনকভাবে মুসলিম উম্মাহর কিছু বিপথগামী ধারাও নিওপ্লেটোনিসম দ্বারা আক্রান্ত। যেমন 'ইসমাঈলি' ফিরকার অবস্থান মৌলিকভাবে প্লটিনসের স্রষ্টার ধারণা ও সৃষ্টিতত্ত্বের অনুরূপ। তারা মহান আল্লাহকে মহাবিশ্বের স্রষ্টা মনে করে না। তাদের কাছে আল্লাহ প্লটিনসের 'পরম একক'-এর অনুরূপ। উল্লেখ্য ইসমাঈলিদের এধরনের আকীদা এবং অন্যান্য আরও বেশ কিছু কারণে তাদেরকে মুসলিম গণ্য করা হয় না। দেখুন—https://tinyurl.com/islamqaismaili এবং

https://islamqa.org/?p=102658। (অনুবাদক)